ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1309-1318
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.350

বিস্মৃতপ্রায় জনপদ দেবীগঞ্জের ব্রাহ্ম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা: একটি পর্যালোচনা

ড. রাহুল কুমার দেব, *সহকারী শিক্ষক (ইতিহাস), বুড়াগঞ্জ কালকুট সিং উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

If 'renaissance' signifies rebirth, the emergence of new values, and a fresh expression of creative power, then the awakening of Bengal in the 19th century can undoubtedly be termed a Renaissance. Raja Rammohan Roy can be considered the pioneer of this movement. The Brahmo Samaj, established under his leadership, arose from the new consciousness and reasoning characteristic of the renaissance. At the begining of the 19th century, traditional Hinduism had largely become ritualistic, leading to various distortions within it. Rammohan was troubled by the prevalent degradation of society, as well as the dogma and hypocrisy associated with Hinduism. In an effort to establish a universal religion rooted in the finest traditions of Hindu monotheism, he founded the 'Brahmo Samaj' or 'Brahmo Sabha' on August 20, 1828, in the home of Firingi Ramkamal Bose. In January 1830, a regular house of worship was founded, and its charter outlined the foundational ideas of the well-known Brahmo movement. When Maharishi Debendranath Tagore joined the Brahmo Samaj in 1838, the disorganized group was turned into a spiritual brotherhood. He established the 'Tattvabodhini Sabha,' a gathering place for the intellectual elite of modern-day Bengal. Debendranath organized formal initiation into Brahmoism in order to identify those who were truly interested in Brahmo Samaj and Brahmo ideal. A pledge was also drafted for initiation. This is how Brahmo Samaj became Brahmo religion. In 1857, Keshab Chandra Sen, who was well-versed in western education, joined Brahmo Samaj, and his inspiring oratory gave the Brahmo movement unprecedented strength. Under his leadership, the Brahmo Samaj grew into a real force in the country, and the way young people joined this religion in droves was never happened before. Keshab visited South Indian cities such as Madras, Poona, Bombay, and Calicut in 1864-65 to spread Brahmoism. He expanded the organization into new places. Keshab gathered a group of enthusiastic enargetic young people who, within a few days, began to outperform him in progressive thinking. Included among them were Shibnath Shastri, Durga Mohan Das, Dwarkanath Gangopadhyay, and Ananda Mohan Bose. The new Brahmos increasingly voiced their objections to Keshab's leadership, his mystical tendencies, and his alleged arbitrariness in running houses of worship. Furthermore, their disputes over the methods of female education and social reform also reached a peak. When Keshab Chandra, rejecting the Native Marriage Act of 1872 (Act III of 1872) that had been introduced among the Brahmos on his own initiative, married his minor daughter to

the King of Cooch Behar according to the old custom, a rupture became inevitable. A new organization, the Sadharan Brahmo Samaj, was established at a meeting convened at the Town Hall on 15 May 1878. A democratic constitution was formulated for this organization. On the other hand, Keshab revitalized the Bharatbarsiyo Brahmo Samaj by renaming it as 'Nababidhan' on 26 January 1880. With the inception of the Nababidhan, Keshab boldly stepped forward to overcome the limitations of narrow religious awareness, beautifully merging pagan traditions, Shakta-Vaishnavism, and mystical practices with the noble ideals and principles of Christianity and Islam. Although somewhat late, this movement spread to various areas of North Bengal, a peripheral region of Bengal, like the rest of India. The Brahmo movement began to flourish in North Bengal during the latter phase of its evolution. Remarkably, the final decade of the nineteenth century marked a vibrant transformation in the social fabric of the people of North Bengal. A variety of factors fueled this remarkable change. The interactions with western individuals and their vibrant culture, the dissemination of western education, the advancement of communication systems, and the introduction of a local autonomy framework were notable among the driving forces. Together, these elements significantly expedited the journey toward modernization in the remote regions of North Bengal. And with this, the Brahmo Samaj reform movement made its significant entrance during this period. In my research article, I have chosen to focus on the Brahmo Samaj movement of Debiganj. The principal objective of this article is to investigate and contemplate the endeavors of both the Sadharan and the Nababidhan Brahmo Samaj in Debiganj, an almost overlooked area in undivided North Bengal, from the latter part of the nineteenth century until the third decade of the twentieth century. Furthermore, this article will also examine the prevailing trends in education and culture within this region.

Keywords: Brahmoism, Education and culture, Local history, North Bengal, Regional development, Renaissance, Social reform

দেবী চৌধুরানীর স্মৃতি বিজড়িত দেবীগঞ্জ বর্তমান বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অন্যতম একটি উপজেলা।[১] তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেবীগঞ্জ ছিল করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলার একটি বড় বন্দর। এছাড়া এটি উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার বিস্তীর্ন জমিদারির অন্তর্গত চাকলাজাত এস্টেটের সদর দফতরও ছিল।[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলার সদর কার্যালয় দেবীগঞ্জে স্থাপন করেন।[৩] ডোমর স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে দেবীগঞ্জ অবস্থিত।[৪] ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দ্বিতীয় বিভাজনের পর দেবীগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়েছিল। সাধারণপন্থী ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টায় দেবীগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হলেও, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে নববিধান ব্রাহ্মসমাজেরও এখানে প্রবেশ ঘটেছিল।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে ও প্রচেষ্টায় দেবীগঞ্জে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রেমী শমসের আলী মিয়াঁ ও বাবু রাধাসুন্দর চক্রবর্তীর অর্থ সাহায্যে প্রথম উপাসনালয়টি নির্মিত হয়।[৫] যদিও এর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে যেহেতু রামকুমার বিদ্যারত্নের উদ্যোগে সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাধারন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি প্রচারকব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাই ধারণা করা হয় যে উক্ত সমাজটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে স্থাপিত। যাইহোক, দেবীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের এই ভবন খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায়, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সমাজের একটি নতুন গৃহ প্রস্তুত করবেন এবং সাধারন ব্রাহ্মসমাজে অংশভুক্ত হওয়ার প্রার্থনায় একটি আবেদনপত্র কলকাতায় প্রেরণ করবেন। গৃহ তৈরির জন্য তারা চাঁদা সংগ্রহ করাও শুরু করেন।[৬] এরপর

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেবীগঞ্জে একটি নতুন উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উত্তরবঙ্গে ধর্মপ্রচারে এসে হলদিবাড়ি ও রংপুরে উপাসনার কাজ করার পর তিনি জলপাইগুড়ির কাছে দেবীগঞ্জে এই নতুন উপাসনা সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] কিন্তু সমাজের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল আরও এক মাস পর। বিশেষ করে সে বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এটি 'দেবীগঞ্জ প্রার্থনা সমাজ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত আবেদনকৃত সেই চিঠির জবাবে তারা এই সময়ে কলকাতার সাধারন ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারন ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে শিবনাথ শাস্ত্রী তার গ্রন্থে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ৩৯ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় Devigunj P.S (প্রার্থনা সমাজ) এর নাম রয়েছে এবং এর প্রতিষ্ঠার বছর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] এইসময় তত্ত্বকৌমুদীতে লেখা হয়েছিল- "বিগত ১৫ই ও ১৬ই মে দেবীগঞ্জ প্রার্থনা সমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। উত্তরবাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য বাবু কালীপ্রসন্ন বসু এবং শ্রীযুক্ত জালালউদ্দিন মিঞা উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। উপাসনা, প্রকাশ্য স্থানে প্রচার এবং সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মগণ অতিশয় উপকৃত হইয়াছেন এবং সাধারনের মধ্যেওআন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।"[৯]

দেবীগঞ্জে যে কয়েকজন ব্রাহ্ম সদস্য বাস করত তারা সবাই ছিল দরিদ্র। প্রথমদিকে কলকাতার ব্রাহ্ম প্রচারক মন্ডলীর মনোযোগ দেবীগঞ্জের দিকে ছিল খুবই কম। তাই এখানকার স্থানীয় উপাসকমন্ডলীর আন্তরিকভাবে ইচ্ছা ছিলো যে, প্রচারক মহাশয়দের সময় সময় এখানে এসে উপদেশ প্রদান এবং এই জাতীয় যে কোনও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তাদের বক্তব্য ছিল দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি ভ্রমণের সময় যদি প্রচারকরা এখানে আসেন তবে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।[১০] আর এর পরেই দেখা গেল কাশীচন্দ্র ঘোষাল, গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, রাম কুমার বিদ্যারত্ন প্রমুখ একাধিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক দেবীগঞ্জে আসেন। ধর্মপ্রচারের জন্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের দেবীগঞ্জে প্রচার যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, সেই বছরের ২১শে চৈত্র রবিবার পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন দেবীগঞ্জে ব্রাহ্ম ধর্মের কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি সেদিন রাতে রেলপথে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দেবীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে সকালে সুমধুর সঙ্গীত সহকারে উপাসনা শুরু হয়। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা, উপাসনার চারটি অংশ গভীরভাবে অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং আবেগপূর্ণ হয়েছিল। দেবীগঞ্জের বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম সদস্য তাদের অতীতের বিভিন্ন পাপের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। উপাসনা পরবর্তী কর্মসূচিতে তিনি 'ঈশ্বরই আত্মার শান্তিদাতা' এই সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তারপর মৃদঙ্গ সহকারে সংকীর্তন হয়েছিল। দুপুরের খাবারের পরে যখন সবাই উপাসনাগৃহে একত্রিত হয়, তখন কিছু বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। যেমন, বিবেকের স্বরূপ বর্ণনা, আদেশবাদ, পরকাল, আত্মার অমরত্ব, উপাসনার ফলাফল কী? এবং একটি ব্রাহ্ম উপাসকের কি ধরনের চরিত্র হওয়া উচিত? এই বিষয়ে আলোচনা হয়ে সভা ভঙ্গ হয়। সন্ধ্যার সময় উপাসনাও অতি সরল হয়েছিল। উপাসনার শেষে রামকুমার বিদ্যারত্ন 'ধর্মীয় জীবনই সুখের জীবন' এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। সমাজ গৃহে জায়গা না হওয়ায় অনেকে বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনেছিলেন। তাঁর গভীর থেকে গভীরতম আবেগের ধার্মিক উপাসনায় এবং জ্বলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় এখানকার ব্রাহ্ম উপাসকরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল।[১১]

সাধারন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াও দেবীগঞ্জে নববিধান ব্রাহ্মসমাজেরও সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এখানে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল মূলত কোচবিহার রাজবংশের একজন বংশধর কুমার গজেন্দ্র

নারায়ণের প্রচেষ্টায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কুচবিহার রাজ্য ছিল নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা সুনীতি দেবীর সঙ্গেঁ।[১২] এই বিবাহ ব্রাহ্ম সমাজে বিভেদ আনলেও সেই রাজ্যের নববিধান ব্রাহ্ম আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। মহারাজা স্বয়ং কেশবচন্দ্রের মত মহাপুরুষের নিকট সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। তার উন্নত জীবনধারা এবং উদার ধর্মভাব তরুণ মহারাজার মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ফলে তিনি চিরকাল ব্রাহ্মধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উৎসাহী ছিলেন।[১৩] নৃপেন্দ্র নারায়ণকে অনুসরণ করে তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্র নারায়ণও এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। নৃপেন্দ্র নারায়ণ অর্থানুকূল্য করেছেন, আর ধর্মের প্রচার করেছেন কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ। কেশবের দ্বীতিয় কন্যা অর্থাৎ সুনীতিদেবীর বোন সাবিত্রীর সঙ্গেঁ তার বিয়ে হয় ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি মেনেই।[১৪] সুনীতি দেবীর মতই কোচবিহার রাজ্যে সাবিত্রী দেবীর বিয়ে কুচবিহারের বর্নহিন্দু রক্ষনশীল গোষ্ঠীর পছন্দ ছিল না। দুটো প্রগতিশীল সংস্কারধর্মী ব্রাহ্ম মেয়ের এ রাজ্যে আগমন যে কুচবিহারে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে কয়েকগুন বৃদ্ধি করবে, এ আশঙ্কা তাদের ছিল। তাই এই প্রস্তাবে কুচবিহারের অধিকাংশ লোক ও দেওয়ান অসম্মতি প্রকাশ করে ও গজেন্দ্র নারায়নকে বিয়ে করতে নিষেধ করে। কেশবচন্দ্রের দেওয়া সাহসে ও মহারাজের ইচ্ছায় তিনি এ বিয়ে করেন।[১৫] স্বভাবতই সাবিত্রী দেবীকে বিয়ের পূর্বে ধর্ম্ম, জাতি, কুল, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহন করায় রাজ্যের লোকেরা প্রতক্ষ্যভাবে তার বিষম শত্রুতা ও হিংসা করতে লেগেছিলেন।[১৬] ১৮৮৬ খ্রীঃ নৃপেন্দ্রনারায়ন ও সুনীতি দেবীর উদ্দ্যোগে সমগ্র দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ নববিধান ব্রাহ্ম মন্দিরটি কোচবিহারে স্থাপিত হয় এবং এর প্রথম সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন কুমার গজেন্দ্র নারায়ন।[১৭] সর্বোপরি তিনি ছিলেন কুচবিহারের রাজগন পরিবার থেকে আসা প্রথম সম্পাদক। নৃপেন্দ্রনারায়ন এবং তার অপত্যদের বাদ দিলে কুমার গজেন্দ্রনারায়নই ছিলেন রাজ্যের আগত ব্রাহ্মদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র যোগসুত্র। স্বভাবতই বহিরাগত ব্রাহ্ম কর্মচারী বা প্রচারকদের, এ রাজ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে অনেকটাই তার ওপড় নির্ভর করতে হয়েছে। পারিবারিক বিদ্রুপ সহ্য করেও গজেন্দ্রনারায়ন কিন্তু তার ধর্মপ্রচার থেকে কখনই সরে আসেননি। তার উদ্দ্যেগেই কুচবিহারে সুরাপান নিবারনী সভা, কেশব আশ্রম, আর্যনারী সমাজ, ব্রাহ্মপল্লী, ব্রাহ্ম বোডিং, ব্রাহ্ম গ্রন্থাগার, প্রচারাশ্রম স্থাপনের ফলে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কুচবিহারে পায়ের নীচে মাটি খুজে পেয়েছিল।[১৮] স্বভাবতই বর্নহিন্দু গোষ্ঠীর ধর্মনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ উভয়েরই পরিপন্থী হয়ে দাড়িয়েছিল গজেন্দ্র নারায়নের এই কার্যকলাপ গুলো। প্রাদপ্রদীপের আলো থেকে তাকে সরিয়ে রেখে এ রাজ্যে ব্রাহ্ম আন্দলনকে স্থিমিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় রক্ষনশীল বর্ন হিন্দু পিউরিটান রাজ কর্মচারীদের মধ্যে। যখন কুচবিহারে Assistant Civil Judge এর কাজ নিয়ে আসেন, তখন যদি তিনি Civil Judge এর পদ প্রাপ্ত হয়ে কুচবিহার রাজ্যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার করেন ও রাজার প্রিয়পাত্র হন, সেই আশঙ্কায় ১৮৮৯ খ্রীঃ তাকে দূরবর্তী জায়গা জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীগঞ্জে মহারাজার চাকলাজাত এস্টেটের দায়িত্বভার সপে দেওয়া হয়।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চাকলাজাত সম্পত্তির সদর কার্যালয় দেবীগঞ্জে স্থাপনের পর এর ব্যবস্থাপনার জন্য নৃপেন্দ্র নারায়ণ একজন প্রধান ও একজন সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের বাহন ছিল হাতি ও পাল্কী। ম্যানেজারদের চালচলন ও জাকজমক ছিল রাজার মতো।[২০] গজেন্দ্র নারায়নকে এই সময় এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।তবে দেবীগঞ্জে বদলি হয়ে এসেও তিনি কিন্তু নববিধান ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার থেকে সরে আসেননি। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেবীগঞ্জে চাকলাজাত এস্টেটের

সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরই তাঁর প্রচেষ্টায় মূলত 'দেবীগঞ্জ নববিধান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরই আশ্বিন মাসের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাতে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল-

> "বিগত শনিবার কোচবিহার মহারাজের জমীদারীর অন্তর্গত দেবীগঞ্জ নামক স্থানে একটি নববিধান সমাজের সুত্রপাত হইয়াছে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় হলদিবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপাসনা করিয়াছেন। অনেকগুলি ভদ্রলোক উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।..... কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেব এক্ষণ মেনেজারের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার উদ্যোগে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তথায় একজন প্রচারক, অবস্থিতি করিয়া কিছু দিন কার্যা করিবার কথা হইয়াছে।"[২১]

দেবীগঞ্জে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নববিধানের প্রচারকরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের কাজে দেবীগঞ্জে আসতে শুরু করেন। পরের মাসেই ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল দেবীগঞ্জে প্রচারে আসেন এবং সেখান থেকে হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার শেষ করে দার্জিলিং ভ্রমণ করেন। ১৯০২ সালের দিকে, অমরাগরী ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য আশুতোষ রায়, হরলাল রায় এবং কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ প্রচারক হিসাবে দেবীগঞ্জে উপস্থিত হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সংগীত, প্রার্থনা ও উপদেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন উষা কীর্তন এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগীত ও বক্তৃতা হয়েছিল।[২২] দেবীগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম উৎসব গুলোতেও একাধিক প্রচারকের আগমন হতো। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রচারকদের নিজের বাড়িতে রেখে তাদের আতিথেয়তা দেখাতেন এবং তাঁর যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার সংক্রান্ত অনেক বই বিক্রি হত।[২৩] দেবীগঞ্জে নববিধান প্রচারক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন ও ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের এক বিস্তারিত প্রচার বিবরণ 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার পাতায় পাওয়া যায়। জানা যায়, ১৮৯১ সালের আশ্বিনের ৫ তারিখ সোমবার নববিধানের এই দুই প্রচারক আমন্ত্রিত হয়ে ফুলবাড়ি থেকে দেবীগঞ্জে পৌঁছান। বক্তৃতা দেওয়া হবে বলে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ আগেই ঢোলের তালে ঘোষণা করেছিলেন। বিকেল ৫টায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দু-তিনশো ভদ্র ও সাধারণ শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান জড়ো হয়। প্রথমে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন 'ইসলাম ধর্ম ও তার প্রকৃত রূপ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং তারপর ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 'ধর্মের উদারতা' সমন্ধে বক্তৃতা করেন। পরের দিন ৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার বিকেলে আবার সেই অনুষ্ঠানস্থলে, ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন 'ওহদানিয়াত কেয়া চিজ হ্যায়' (একত্ববাদ কী?) এই বিষয়ে উর্দুতে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। জৈনপুরে বসবাসকারী একজন আরবীয় ভাষাবিজ্ঞ মুসলিম হাফেজ (কোরআন মুখস্থকারী) শ্রোতা শ্রেণীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তিনি উর্দুতে 'একত্ববাদ' বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বাংলা ভাষায় কিছু কথা বলেন। ৭ই আশ্বিন বিকালে করতোয়া নদীর বুকে একটি নৌকায় সংকীর্তন হয়। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সেই এলাকার কীর্তন বিশেষজ্ঞদের তিনটি দল বাদ্যযন্ত্র, যেমন খোল এবং করতাল সহকারে এসে জড়ো হয়েছিল। দলগুলো পালাক্রমে রাত ৮টা পর্যন্ত উৎসাহের সাথে সংকীর্তন নামক ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করে। পরের দিন ৮ই আশ্বিন, ম্যানেজারের বাংলোতে বিশেষ উপাসনা ও ধর্মোপদেশ পরিচালিত হয় যেখানে ডাক্তারবাবু এবং জমিদারীর আমলারা সেই উপাসনায় অংশ নেন। ৯ তারিখ শুক্রবার সকালে প্রচারক ভাতৃদ্বয় হলদিবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দেবীগঞ্জে প্রাত্যাহিক, মধ্যাহ্নিক উপাসনায় কুমার সাহেব গজেন্দ্র নারায়ণ নিয়মিত যোগদান করেছেন। তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আদর স্নেহের সাথে নিজ বাড়িতে স্থান দিয়ে প্রচারকদের আতিথেয়তা আপ্যায়ন করেছেন এবং তার যত্ন ও প্রচেষ্টায় প্রচার সংক্রান্ত অনেকগুলো বই বিক্রি হয়েছিল। আর তার জন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁর কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল।[২৪]

এই সময়কালে, কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের উদ্যোগী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেবীগঞ্জে একাধিক জনহিতকর কাজ করা হয়েছিল। ডোমার স্টেশন থেকে আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দেবীগঞ্জে আসতে হতো। এই পথ দিয়ে পথিকদেরকে অনেক কষ্টে আসতে হতো। আশেপাশে কোন জলাশয় বা কূপ ছিল না। তাই কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ এবং তার স্ত্রী কেশব চন্দ্রের কন্যা সাবিত্রী দেবী উভয়ে ভ্রমণকারীদের পানীয় জলের অভাব দূর করতে এবং তাদের তৃষ্ণা মেটাতে পানীয় জল বিতরণের জন্য একটি জায়গা অর্থাৎ 'জলসত্রের' ব্যাবস্থা করে দেন। পথিকদের জন্য গুড়, ছোলা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতো। প্রথমে পথিকরা সেই খাবার গ্রহণে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা ভেবেছিল এর জন্য তাদের মূল্য দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত চাকরেরা দু-চারজনকে জোর করে খাওয়াবার পর দলবেঁধে পথিক এসে তৃষ্ণার সময় জল পান করে তৃপ্ত হয়ে প্রচুর আশীর্বাদ করে চলে যেত।[২৫] স্থানীয় কীর্তন গায়কদের দলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রবেশ ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ দেবীগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসবে একাধিক কীর্তনের দলকে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি প্রত্যেক দলে এক একটি ব্রাহ্ম সঙ্গীত সম্বলিত বই বিতরণ করে তাদের উৎসাহিত করতেন। এমনকি তিনি একজন সংগীতে পারদর্শী নববিধানে বিশ্বাসী কর্মচারীকে প্রতি রবিবার তাদের ব্রাহ্মসংগীত শেখানোর জন্য নির্দেশ দেন।[২৬] গজেন্দ্র নারায়ণের ছেলে বিকাশেন্দ্র নারায়ণ এ প্রসঙ্গে তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন-

> "When we were in Debigunj Chaklajat Estate my father used to collect people from villages and taught them Brahma sangit or religious songs. Soon they became good singers. We are little boys at that time and used to join the kirtan parties. Some of the Brahmo Bhajans were translated in their own colloquial language and sung. A song, I remember was – 'Ekje, manus ache, tare dakle katha koi` ie. there is a man who speaks if we call him etc."[২৭]

গজেন্দ্র নারায়ণ ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেবীগঞ্জে কোচবিহারের মহারাজার চাকলাজাত এস্টেটের সুপারিনটেনডেন্ট থাকাকালীন সেই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সুরা সেবনের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারে সামিল হন। মাদক গ্রহণের কুফল সম্পর্কে ব্রাহ্ম প্রচারকদের বক্তৃতা শ্রোতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করতে থাকে।[28] স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি দেবীগঞ্জের অনেক দরিদ্র অসহায় মানুষকে একটি বিশেষ সাহায্য হিসেবে চাকরির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।[২৯]

দেবীগঞ্জ অঞ্চল কুচবিহার রাজ্যের চাকলাজোতের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এখানকার যে কোন কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় কোচবিহারের ব্রাহ্ম রাজ পরিবারের অবদান থাকত।[৩০] ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবের ফলে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ চিরকাল ধর্মকর্মে উৎসাহী ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিলেন এবং প্রজাকল্যানকামী ও সংস্কৃতিমনস্ক শাষক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। মহারাজা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে দেবীগঞ্জে একটি 'দাতব্য চিকিৎসালয়' ও 'জগদ্বন্ধু ঠাকুরবাড়ি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয় 'মহারাজা স্মৃতিমন্দির' নামক নাট্যশালা ও পাবলিক লাইব্রেরি।[৩১] বারমাসে তের পার্বণের আমেজ লেগে থাকতো জমিদারি সদর কার্যালয়ে। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসাবে সেকালে এই অঞ্চলের নিজস্ব ধারা তৈরী হয়েছিল।[৩২] খুব সম্ভবতঃ কুচবিহার-রাজ আনুকূল্যেই দেবীগঞ্জে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার লাভ ঘটে। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় পরবর্তীকালে ১৮৮০/৮১ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড থেকেও এই বিদ্যালয়ে যথারীতি সাহায্য প্রদান করা হত। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজানুকূল্যেই ঐ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে

রূপান্তরিত হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম কুচবিহারের স্বনামধন্য শিক্ষানুরাগী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামানুসারে চিহ্নিত হয় 'দেবীগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল'। এই গৃহনির্মাণ বাবদ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন কুচবিহার রাজ তহবিল, এবং এই বিদ্যালয়ের সমস্ত পৌনঃপুনিক ব্যয়ও ঐ দরবার থেকে বহন করা হত। ঐ বিদ্যালয় গৃহের গঠন প্রণালীও ছিল কুচবিহার জেক্সিস স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজের আদি গৃহগুলির অনুরূপ। এই বিদ্যালয়ই জলপাইগুড়ি জেলার দ্বিতীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার চার বছরের মধ্যেই একটি ছাত্র ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।[৩৩] পরবর্তীকালে ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কোচবিহার রাজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের বসবাসের জন্য একটি হোস্টেল নির্মান করে দেওয়া হয়।[৩৪] গজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর তার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর উদ্যোগে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনে দেবীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন বালককে পদক প্রদান করা হতো।[৩৫] নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় সে যুগের একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। শ্রী জে. এন তালুকদার, আই সি. এস. (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারি), ডাঃ কাজী সামছুল আলম, এফ. আর. সি. এস, বিচারপতি আব্দুল খালেক, পাক আমলের ডেপুটি স্পীকার গমির উদ্দিন প্রধান, গোঠি এস্টেটের ইতিহাস ও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা আমির উদ্দিন প্রধান, মর্নিং নিউজের প্রাক্তন সম্পাদক আলহজ্ব মোঃ শামছুল হুদা এবং আরো অনেকেই এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন।[৩৬] এছাড়া এই দেবীগঞ্জেই জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে প্রথম বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৩৭] ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে যখন কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের পরিবার দেবীগঞ্জে অবস্থান করছিলেন, তখন মহারাণী সুনীতি দেবী সেখানে গিয়ে আট দিন ছিলেন।[38] সম্ভবত সে সময় সুনীতি দেবীর উদ্যোগী প্রচেষ্টায় দেবীগঞ্জে নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে গণেশ চন্দ্র চক্রবর্তী 'কোচবিহার দর্পণ' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> "পুণ্যবতী মহারাণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবী, দেবীগঞ্জে শুভাগমন করিয়া স্ত্রী শিক্ষার অভাব দুরীকরনে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুনীতি-বালিকা বিদ্যালয় দেবীগঞ্জের মস্ত অভাব দুরীভূত করিয়া উন্নতিমুলক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হইয়াছে।"[৩৯]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের একটি সম্মানিত মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, জেলার মেয়েদের জন্য ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে যে দুটি বিদ্যালয়কে তারা অনুদান প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল জলপাইগুড়ি শহরে এবং আরেকটি ছিল দেবীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি ছিল জেলার মেয়েদের জন্য প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়।[৪০]

কোনো কোনো নববিধানবাদী ছোট-বড় যেকোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে পারিবারিক উৎসব পালন করতেন। গজেন্দ্র নারায়ণের দেবীগঞ্জে থাকার সময়, তিনি তার ছেলের অন্নপ্রাশন এবং তার মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রাহ্ম রীতিতে একাধিক পারিবারিক উৎসব করেছিলেন। এরকম একটি উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতারা সাহেবের বাড়িতে নামগান গেয়েছিলেন। বাড়িটি ফুল, পাতা, নিশান ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। দুপুরে পারিবারিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 70 থেকে 80 জন গরিব কাঙালিকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল। সবশেষে রাতে কুমার সাহেব স্থানীয় 'ব্রাহ্ম' সদস্যদের সাথে একত্রে প্রীতিভোজন করেন।[৪১] সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্ম ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ক্রিয়াকর্মকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তিনি পরোক্ষভাবে ধর্ম প্রচারে অনেক সহায়তা করেছিলেন। দেবীগঞ্জে একাধিক ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম সমর্থনে তাদের অনুকূল মতামত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। যেমন দেবীগঞ্জের বাবু

মতিলাল বড়ুয়া কলকাতার লিলি কটেজ প্রাঙ্গণে ভাই উমানাথ গুপ্তকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে নববিধান ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৪২]

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্মান্দোলন কেবল নিছক ধর্মসাধনার একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত আন্দোলন ছিলোনা। সামাজিক জীবনও এই ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হয়েছিল। তাই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে যেমন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন করেন, তেমনি সমগ্র সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সুফল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে সকলকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও সাবলম্বী হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সে যুগে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে লাভ করেছে উদার ধর্মনীতির শিক্ষা এবং ধর্মীয় সামাজিক সর্বপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পেয়েছে বিশ্বস্ত সঙ্গী। আবার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে সচেতন মানুষ দেশভক্তি ও জাত্যভিমানের দীক্ষা পেয়েছে এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে। বহু যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতির ঘূর্ণাবর্তে উদ্ভ্রান্ত-যৌবনের উন্মাদনাকে প্রশমিত করেছে ব্রাহ্মদের মার্জিত রুচি ও চরিত্রের সংস্পর্শে এসে।[৪৩] উত্তরবঙ্গের এক বৃষ্মিতপ্রায় প্রান্তকেন্দ্রিক জনপদ দেবীগঞ্জেও ব্রাহ্ম আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার সুফলগুলি বেশীরভাগই ভোগ করেছে উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা। নগরভিত্তিক আন্দোলন গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেবীগঞ্জের খুব অল্প সংখ্যক জনসাধারণই এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাই ভবিষৎ প্রজন্মকে যদিও এই ধর্ম তার ছত্রছায়ায় বাধতে পারেনি তা সত্ত্বেও এর সামাজিক মূল্যকে কখনো অস্বীকার করা যায়না। ব্রাহ্মরাই জাতপাতের ইস্পাত কাঠিন্য ভাঙ্গার সাহস দেখিয়ে এবং অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্নুতা ও সৌহার্দ্যবোধের যে নির্দশন রেখেছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পরবর্তী দশকগুলোতে দেবীগঞ্জের মত উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত প্রান্তীয় জনপদে সামাজিক স্থিতি বিরাজ করেছিল, উৎকর্ষতা লাভ করেছে এখানকার শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা।

তথ্যসূত্র:

[১] https://panchagarh.info/debiganj/

[২] ধর্ম্মতত্ত্ব, ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: বিধান প্রেস, ১লা আশ্বিন ১৮১১ শক, পৃ.২০০

[৩] লতিফ, আব্দুল, প্রাচীন করতোয়া ও দেবীগঞ্জ: অখন্ড জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কথা, কর, অরবিন্দ (সম্পা), 'কিরাতভূমি': জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ বর্ষ পুর্তি উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (১৮৬৯-১৯৯৪), জলপাইগুড়ি: চক্রবর্তী, প্রদীপ কুমার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫, পৃ. ৪৮-৪৯

[৪] ধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, বিশ্বনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৩ শক, পৃ.২১০

[৫] তত্ত্বকৌমুদী, ঘোষ, ভুবন মোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: সাধারন ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১লা বৈশাখ ১৮০৩ শক, পৃ.২৬১

[৬] তদেব, পৃ.২৬১

[৭] তত্ত্বকৌমুদী, ঘোষ, ভুবন মোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৩ শক, পৃ.২৭২

[৮] Sastri, Sivanath History of the Brahmo Samaj, Vol 2, Kolkata: published by Chatterjee, R. 1912, p.552

[৯] তত্ত্বকৌমুদী, ঘোষ, ভুবন মোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০৩ শক, পৃ.৩০০

[১০] তদেব, ১লা বৈশাখ ১৮০৩ শক, পৃ.২৬১

[১১] তদেব, পৃ.২৬১

[১২] Das, Bhuban Mohan (ed.) *Brahmo public opinion*, Kolkata: Brahmo Mission Press, April 4th, 1878, p.16

[১৩] দাশ, কমলেশ, সামন্ত রাজ্য কোচবিহারে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন, চট্টপাধ্যায়, গৌতম (সম্পা), ইতিহাস অনুসন্ধান (২য় খন্ড), কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৭, পৃ.২২৬

[১৪] নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও গজেন্দ্র নারায়ণের একই প্রপিতামহ, তাঁর নাম মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন মেঘেন্দ্র নারায়ণ। তার চার পুত্রের মধ্যে চতুর্থ হলেন ভবেন্দ্র নারায়ণ। তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র কোচবিহারের প্রথম ব্যারিষ্টার ২৪ বছর বয়সি গজেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই আগষ্ট কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় মেয়ে সাবিত্রী দেবীর বিয়ে হয় কোলকাতায় ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি মেনেই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে ১৮৮০– ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ব্রাহ্ম বিবাহের যে তালিকা রয়েছে তার ১২৯ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় এই বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: Collect, Sophia Dobson (ed.), *The Brahmo Year Book for 1881, Brief Record of work and life in the Theistic Churches of India,* London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1881, p.147

[১৫] দেবী, সাবিত্রী, স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, কলকাতা: লক্ষীবিলাস প্রেস, ১৯২৮, পৃ.১১

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৩১,৫০,৫১

[১৭] "Brahmo Samaj building Finished'' in Annual Administrative Report of Cooch Behar State for the year of 1887-1888, Cooch Behar: Cooch Behar State Press, 1888, pp.29-36; Also see, Kopf, David, The Brahmo Samaj and the shaping of the modern Indian mind, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1979, p.329

[১৮] Narayan, Bikashendra, Brief Reminiscences of Late Kumar Gajendra Narayan, Sinha, Nirmal Chandra (ed.) *The World and the New Dispensation,* Autumn Souvenir, Kolkata: Bhartbarsiya Brahmo Samaj, Bhadrotsav 1959, pp.26-27

[১৯] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

[২০] লতিফ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

[২১] ধর্ম্মতত্ত্ব, ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১লা আশ্বিন ১৮১১ শক, পৃ.২০০

[২২] ধর্ম্মতত্ত্ব, নাথ, কে. পি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১লা আষাঢ়, ১৯৫৯ সংবৎ, পৃ.১৩১

[২৩] ধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, বিশ্বনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৩ শক, পৃ.২১০

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ.২১০

[২৫] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

[২৬] ধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, বিশ্বনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৩ শক, পৃ.২১০

[২৭] Narayan, Bikashendra. *Op.cit.,* p.27

[২৮] মজুমদার, অরুপ জ্যোতি, উত্তরবঙ্গে অসমাপ্ত মাদক বিরোধী আন্দোলন, ব্রহ্মচারী, তপব্রত (সম্পা) ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৪৫ বর্ষ, সপ্তম- নবম সংখ্যা, কলকাতা: ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৫

[২৯] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭

[৩০] পাকড়াশী, অমিয় কুমার, জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষা বিস্তারের রূপরেখা, সান্যাল, চারুচন্দ্র ও অনান্য (সম্পা), জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯- ১৯৬৮), জলপাইগুড়ি: জেলা শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, ১৯৭০, পৃ.১৭১-১৭২

[৩১] লতিফ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

[৩৩] পাকড়াশী, অমিয় কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১-১৭২

[৩৪] *The Annual Administration Report of the General Administration and Criminal justice of the Cooch Behar State for the year 1927-28*, Cooch Behar: Cooch Behar State press, 1928, p.38

[৩৫] *The World and the New Dispensation*, Kolkata: Bharatbarsiya Brahmo Samaj, Septembar 17, 1925, p.7

[৩৬] লতিফ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

[৩৭] পাকড়াশী, অমিয় কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১-১৭২

[৩৮] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

[৩৯] চক্রবর্তী, গনেশ চন্দ্র, জন্ম তিথি স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি (দেবীগঞ্জ), ঘোষাল, শরৎচন্দ্র ও বিশ্বাস, জানকী বল্লভ (সম্পা), কোচবিহার দর্পণ, প্রথম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, কোচবিহার: কোচবিহার স্টেট প্রেস, ১লা পৌষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.২১৬

[৪০] দাশগুপ্ত, কল্যাণী নারীশিক্ষা ও নারী আন্দোলন, ঘোষ, তারাপদ (সম্পা) পশ্চিমবঙ্গ, ৩৪ বর্ষ, ৪৮, ৪৯, ৫০ সংখ্যা (জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা), কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৮, পৃ.৩১৯

[৪১] ধর্ম্মতত্ত্ব, ঘোষ, জগবন্ধু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১লা ভাদ্র, ১৮১৪ শক, পৃ. ১৭৬; এছাড়া দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

[৪২] *The World and the New Dispensation,* Vol – XVI, No-34, Printed and Published by Nath, K.P Kolkata: Mangalganj Mission Press, September 16, 1906, p.402

[৪৩] চট্টোপাধ্যায়, অরুন কুমার, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভা সমিতি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম এশিয়ান সংস্করণ, কলকাতা: এশিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃ.৫৩-৫৪